হল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পাঠক্রমের দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical foundation of curriculum) —ইংরাজি শব্দ Philosophy কথাটি এসেছে দুটি গ্রিক শব্দ Philos এবং Sophia থেকে। Philos কথাটি অর্থ হল অনুরাগ এবং Sophia কথাটির অর্থ হল জ্ঞান। এই দুটি কথার অর্থ একত্রে দাঁড়ায় জ্ঞানের প্রতি আসক্তি। এই বিষয়টির মূল উদ্দেশ্য হল চিরন্তন সত্যের অনুসন্ধান করা এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সুসংবন্ধ ও সুসংহত জ্ঞান প্রদান করা। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে দর্শন মানুষের জীবনের প্রকৃতি ও লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ মানুষের জীবনের লক্ষ্য দর্শনের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে শিক্ষা। বস্তুতপক্ষে দর্শন জীবনের জন্য যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবার প্রণালী নির্দেশ করে শিক্ষা। আর পাঠক্রম হল উপায় যার উপর নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। সুতরাং দর্শনের কাজ হল শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা, আর শিক্ষার কাজ হল পাঠক্রমের মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে কীভাবে পৌঁছানো যায় তার পথ নির্দেশ করা। এখানে পাঠক্রম হল দর্শন নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় স্বরূপ।

ভূমিকা·

পাঠক্রমের দার্শনিক ভিত্তি আলোচনা করার পূর্বে জীবনের মৌলিক দিকগুলি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার। এইগুলি হল এমন সব মৌলিক সূত্র যা পাঠক্রম রচনার মূল ভিত্তি। প্রথমত পাঠক্রম রচনা করা কালে বিশেষভাবে ব্যক্তিজীবনের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য যদি ব্যক্তিজীবনের দিকে নজর না দিয়ে নির্ধারণ করা হয়, তাহলে সেই লক্ষ্য অনুসারী পাঠক্রম সুফল প্রদান করতে ব্যর্থ হবে। বস্তুত পক্ষে শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিজীবনের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। তাই জীবন ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞান থাকা পাঠক্রম রচনাকারীর কাছে একটি অপরিহার্য বিষয়। এই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সরবরাহ করতে পারে একমাত্র দর্শন। দ্বিতীয়ত শিক্ষার অন্যতম কাজ হল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সত্ত্বার বিকাশ সাধন। স্বামী বিবেকানন্দও এ কথা স্বীকার করেন। পাঠক্রম প্রণয়নকারীকে দেখতে হবে

মৌলিক উৎস

Scanned by CamScanner

যেন পাঠক্রমটি শিক্ষার্থীর সেই বিশেষ দিকটি পূরণ করতে সমর্থ হয়। আর অন্তর্নিহিত সত্ত্বা কথাটি দর্শনেরই অঙ্গীভূত। তৃতীয়ত, ব্যক্তিজীবনকে যদি সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করতে হয়, তাহলে তাকে কতকগুলি মূল্যবোধের অধিকারী হতে হবে। আদর্শ জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে এইগুলির অনুশীলন অত্যন্ত অপরিহার্য। শিক্ষাক্রম প্রস্তুতকারীকে পাঠক্রম রচনাকালে সুগভীর নজর রাখতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা নির্বাচিত অভিজ্ঞতাসমূহের মাধ্যমে শাশ্বত ও স্থায়ী মূল্যবোধগুলির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। এক্ষেত্রেও মূল্যবোধের ধারণাটি দর্শন থেকে সংগৃহীত। চতুর্থত, মানবসত্তার অস্তিত্ব শুধু তার জড়সত্তার মধ্যেই সীমাবন্ধ নয়। বরং তার একটা আধ্যাত্মিক সত্ত্বাও রয়েছে। তার এই সত্ত্বাটি উন্মোচিত হওয়া দরকার। পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে পরিগণিত হওয়ার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। সেজন্য পাঠক্রম প্রণয়নকারী এমনভাবে পাঠক্রমটি প্রণয়ন করবেন যাতে শিক্ষার্থী পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে তার আধ্যাত্মিক সত্তাটি উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। আধ্যাত্মিক সত্তা কথাটি দর্শনের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। পঞ্চমত, সার্থকভাবে জীবনযাপন করতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে জীবনাদর্শ গঠন করতে হবে। কারণ প্রত্যেকেই তার নিজস্ব জীবনাদর্শানুযায়ী জীবন পরিচালনা করে থাকে। জীবনাদর্শ ছাড়া সুসংহতভাবে জীবন পরিচালনা করা অসম্ভব ব্যাপার। সেজন্য পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে যাতে উন্নত জীবনাদর্শ গড়ে ওঠার সুযোগ থাকে সেইদিকে নজর রেখে পাঠক্রম প্রণয়ন করতে হবে। সুতরাং আলোচনান্তে লক্ষ করা যায় যে পাঠক্রমের ভিত্তির মূল উৎসগুলি, যেমন— অন্তর্নিহিত সত্ত্বা, মূল্যবোধ, আধ্যাত্মিক সত্ত্বা, জীবনাদর্শ, ব্যক্তিজীবন ইত্যাদি সবই দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা থেকে উৎসারিত।

দর্শনের প্রভাব

দর্শনের মূলতত্ত্ব নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে। উল্লেখযোগ্য মতবাদগুলি হল ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ, জড়বাদ, মার্কসবাদ ইত্যাদি। এই মতবাদে বিশ্বাসী চিন্তাবিদগণ তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের পাঠক্রমের সুপারিশ করেছেন। পাঠক্রমের ভিত্তি হিসাবে এইসব দর্শনের বিভিন্ন মতবাদগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

প্রথমত, ভাববাদীদের কাছে এই জড় জগতের বাইরে আরও একটি জগৎ আছে। সেই জগতের নাম হল ভাব জগৎ যার সর্বময় কর্তা হলেন পরম ব্রহ্ম। প্রতিটি মানুষ সেই পরম সত্ত্বার এক একটি ক্ষুদ্র অংশ। মানব সত্ত্বার কাম্য বস্তু হল পরম সত্ত্বাকে উপলব্ধি করা। এজন্য ভাববাদীদের কাছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল আত্ম-উপলব্ধি। এ ছাড়া আত্মোৎকর্ষণ ও আত্ম-উন্মেষণের উপরও এই মতবাদ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এজন্য তাঁরা শিশুর মানসিক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক বিকাশের প্রতি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বিশেষত তারা মনে করেন যে শিশুর এই সব দিকের বিকাশ তিন ধরনের কর্মের সঙ্গে যুক্ত। এগুলি হল— বৌদ্ধিক, নান্দনিক (aesthetic) এবং নৈতিক। বৌদ্ধিক বিকাশের উপযোগী পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল— সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত,

Scanned by CamScanner

ভূগোল ইত্যাদি। আর নান্দনিক দিকের বিকাশকে সমৃদ্ধ করার জন্য চারুকলা, কাব্যপাঠ, কারুশিল্প ইত্যাদি বিষয় পাঠক্রমের মধ্যে সংযোজন করার সুপারিশ করেছেন। অন্যদিকে নৈতিক বিকাশের জন্য দর্শনশাস্ত্র, নীতিবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয় পাঠক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন। উপরোক্ত বিষয়গুলি অধ্যায়নের ফলে জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের মধ্যে যে সম্মিলন ঘটবে তারই ফলশ্রুতি হিসাবে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ, সৌন্দর্যানুভূতির বিকাশ এবং নৈতিক চেতনার বিকাশ সাধন ত্বরান্বিত হবে।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃতিবাদীদের কাছে বস্তু জগৎ সত্য আর সব মিথ্যা। বস্তু জগতের বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। চিরন্তন সত্য বা চিরন্তন মিথ্যা বলে কিছু নেই। বাহ্যিক প্রকৃতির দ্বারা মানুষের অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়। ফলে এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকদের কাছে শিক্ষার লক্ষ্য হল আত্মপ্রকাশনা (Self-expression) ও আত্ম-সংরক্ষণ (self-preservation)। যদিও এঁরা নির্দিষ্ট পাঠক্রমে বিশ্বাসী নন, তথাপি আত্ম-প্রকাশনা ও আত্মসংরক্ষণের জন্য পাঠক্রমের মধ্যে যে সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন, সেগুলি হল— ভাষা, গণিত, ভৌতবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ব্যায়াম, খেলাধূলা, প্রকৃতিপরিচয় ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, প্রয়োগবাদীরা মনে করেন যে জীবনের ক্ষেত্রে যার প্রয়োজন আছে তাই সত্য। সত্য বা মিথ্যা যাচাই করা হয় উপযোগিতার নিরিখে। উপযোগিতাই হল প্রয়োগবাদের মূল কথা। যেহেতু এই দর্শন প্রয়োজনের ভিত্তিতে মানুষের জীবনকে বিচার করার চেষ্টা করেছে, তাই এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা বলেননি। কারণ সময়ের সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজনও পরিবর্তিত হয়। তবে তাঁরা শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে জীবনের জন্য নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করার কথা বলেছেন। যেহেতু মূল্যবোধগুলি সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল, তাই তাঁরা কোনো নির্দিষ্ট পাঠক্রমের কথা বলেননি। পাঠক্রমের ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য হল— (১) পাঠক্রম হবে পরিবর্তনশীল, (২) পাঠক্রমে সমাজের চাহিদা বিবেচিত হবে, (৩) বিশেষ সমাজ বা কালের জন্য পাঠক্রম নির্দিষ্ট হবে না· এবং (৪) পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চতুর্থত, বাস্তববাদীর কাছে যা প্রত্যক্ষ করা হয় বা যার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় তাই-ই বাস্তব। সাধারণত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুজগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব হয়। ফলে ইন্দ্রিয় জগতের সব কিছুই বাস্তব। এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ মনে করেন যে জ্ঞেয় বস্তু বাইরের জগতে অবস্থান করে। এক্ষেত্রে জ্ঞাতা বাইরের বস্তুজগৎ থেকে বিভিন্নভাবে জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে বস্তুটির যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হয়। বস্তু যেভাবে আছে সেইভাবেই তার বৈশিষ্ট্যকে বাস্তব বলে গণ্য করা হয়। আত্মগত বা তত্ত্বগত অবস্থার চেয়ে বিষয়গত দিকের প্রতি এই মতবাদ সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। এই দর্শনের সঙ্গে বর্তমান জগতের সংস্পর্শ থাকায় তাঁরা শিক্ষাকে বাস্তবের সঙ্গে সংযুক্ত

Scanned by CamScanner

করার পক্ষপাতী। ফলে তাঁদের কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ইন্দ্রিয়গুলির যথাযথ অনুশীলন ও উপযুক্ততা অর্জন করানো। এর ফলে ব্যক্তি বস্তু জগতের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে সমর্থ হবে। প্রকৃতপক্ষে বস্তু জগতের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করাই হল এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য। যেহেতু এই দর্শন বস্তুজগতের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে, তাই বর্তমান জগতের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্য যে ধরনের জ্ঞান, কর্ম বা দক্ষতার প্রয়োজন সেই ধরনের বিষয়বস্তু পাঠক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। তবে যে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল— প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি।

পঞ্চমত, মার্কসবাদীদের কাছে উৎপাদনী ক্রিয়াকর্মের মধ্যে জীবনের সত্য নিহিত রয়েছে। উৎপাদন পদ্ধতিই সমাজের চালিকা শক্তি। প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থা তৈরি হয় উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনী সম্পর্কের উপর। বিশেষত সমাজের মধ্যে যে শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টি হয় তা মূলত উৎপাদন পদ্ধতি ও তার উৎপাদনী সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। তাই শ্রেণিহীন ও শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থায় সর্বহারাগণই হবে ভবিষ্যৎ শাসক। এদের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালানো দরকার। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষায় সমসুযোগ সৃষ্টি করে শ্রেণিহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা। এইজন্য পাঠক্রমে এমন সব অভিজ্ঞতার সংযোজন করতে হবে যাতে উৎপাদনী কর্মের সঙ্গে যুক্ত থেকে শিশুর মধ্যে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টি হয় এবং বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্য সমাজের প্রয়োজনীয় যেসব অভিজ্ঞতাসমূহের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল— বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, জীববিদ্যা, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনায় লক্ষ করা যায় যে দার্শনিকগণ যেভাবে জগৎকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, সেইভাবে তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এক একটি দার্শনিক মতবাদ গড়ে তুলেছেন। আর এইসব মতবাদকে ভিত্তি করে কিংবা তাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। আবার লক্ষ্যগুলিতে উপনীত হওয়ার জন্য উপায়ের পথ নির্দেশ করেছে। এইসব উপায়গুলিই হল পাঠক্রম এবং অভিজ্ঞতাসমূহ নির্বাচনের পিছনে যেসব তাত্ত্বিক মতাদর্শ রয়েছে সেইগুলি হল অভিজ্ঞতাসমূহ নির্বাচনের ভিত্তি। প্রতিটি দার্শনিক সম্প্রদায় (School of Philosopher) নিজস্ব মতাদর্শে অবিচল থেকে যুক্তিসিদ্ধ পাঠক্রমের অবতারণা করেছেন। এই পর্যায়ে পাঠক্রম প্রণয়নকারীকে খসড়া পাঠক্রম উন্নয়ন করার পূর্বে পাঠক্রম তৈরির বিভিন্ন ভিত্তিগুলির সাথে সম্যকভাবে পরিচিত হতে হবে। তবেই তিনি সময় ও দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে মিল রেখে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পাঠক্রম প্রস্তুত করতে সমর্থ হবেন। এইরূপ পাঠক্রম একদিকে যেমন শিশুর চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটাবে, অন্যদিকে যুগের সঙ্গে তাল রেখে তেমনি দেশ ও

উপসংহার

Scanned by CamScanner

দশের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হবে। তাই পাঠক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে পাঠক্রমের দার্শনিক ভিত্তি একটি অত্যন্ত অপরিহার্য অঙ্গ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পাঠক্রমের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Psychological Foundation of Curriculum)— বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুই হল শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রধানতম উপাদান। এই উপাদানটিকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রক্রিয়া আবর্তিত হয়ে থাকে। ফলে এইরূপ পরিস্থিতিতে যদি শিশুর কোনো অস্তিত্বই না থাকে, তাহলে শিক্ষাপ্রক্রিয়া অর্থহীন হয়ে পড়বে এবং তা শিশুর প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হবে। তাই পাঠক্রমটি শিশুর মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করতে হবে। কারণ যেসব সম্ভাবনা নিয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করে, এগুলি যদি পাঠক্রমের মাধ্যমে পরিপূরণ করা সম্ভব না হয় তাহলে তার ব্যক্তিজীবন পঙ্গু হয়ে পড়বে। আর এইরূপ শিশুও সমাজের কোনো উপকারে আসবে না। এজন্য পাঠক্রম রচিত হবে শিশু মনের চাহিদার ভিত্তিতে। অর্থাৎ এখানে শিশুই হল প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এ ছাড়া শিশু একটি জীবন্ত সক্রিয় সত্তা। সক্রিয়তাই হল এই উপাদানটির প্রধান ও স্বাভাবিক ধর্ম। নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্টভাবে অধ্যয়ন করা এই সত্ত্বাটির পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে পাঠক্রমটি যদি সক্রিয়তাভিত্তিক, কর্মভিত্তিক, বাস্তবভিত্তিক, চাহিদাভিত্তিক, ও জীবনকেন্দ্রিক না হয়, তাহলে পাঠক্রমের কার্যকারিতা হ্রাস পাবে। এই ক্ষেত্রে পাঠক্রমের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ভূমিকা

ভিত্তি হিসাবে পাঠক্রমের মনোবৈজ্ঞানিক দিকটি আলোচনা করার পূর্বে তার মৌলিক দিকগুলি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই নীতিগুলিই পাঠক্রম প্রণয়নকারীকে পাঠক্রম রচনাকালে সচেতন করে তুলতে সমর্থ হবে। পাঠক্রম প্রণয়নের প্রাক্কালে যদি তিনি এইসব ধারণা সম্পর্কে জ্ঞাত না হন, তাহলে শিশুর মানসিক দিকের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এর ফলে পাঠক্রমও গতানুগতিকতার দোষে দুষ্ট হয়ে পড়বে। এই প্রসঙ্গে নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি আলোচনা করা হল—

মৌলিক নীতি

প্রথমত, পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত অভিজ্ঞতাসমূহ হবে বাস্তবভিত্তিক। কল্পনাপ্রসূত বা অবাস্তব অভিজ্ঞতা শিশুর মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করতে পারবে না। এমনকি বাস্তব পরিস্থিতিতে সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হবে।

দ্বিতীয়ত, শিশুর শিক্ষা কর্মভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হলে কর্মকেন্দ্রিক নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে পাঠক্রম প্রণয়ন করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে শিশু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। এইক্ষেত্রে কর্ম হবে একটি মাধ্যম মাত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কর্ম হবে গৌণ এবং জ্ঞান হবে মুখ্য।

তৃতীয়ত, পাঠক্রম প্রণয়নকারীকে শিক্ষাক্রম প্রণয়নকালে সক্রিয়তার নীতিকে গোচরে আনতে হবে। শিশুর মধ্যে যে সক্রিয়তার ধর্মটি নিহিত রয়েছে সেটিকে ভিত্তি করে

Scanned by CamScanner

পাঠক্রমের অভিজ্ঞতারাজি নির্বাচন করতে হবে। শিশু আত্ম-সক্রিয়তার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করবে তা তার মনে স্থায়ী ছাপ রেখে যাবে।

চতুর্থত, পাঠক্রম উন্নয়নের সময় শিশুর চাহিদা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। শিশুর চাহিদার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে যদি পাঠক্রম রচিত হয়, তা হলে তার স্বাভাবিক জীবন বিকাশ ব্যাহত হবে। আর এই ধরনের পাঠক্রম তার জীবনে বিশেষ কোনো কাজেও আসবে না। পাঠক্রম প্রণয়নকারীকে শিশুর চাহিদার প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

পঞ্চমত, পাঠক্রম হবে সমন্বয়ভিত্তিক। পাঠক্রম উন্নয়নকারীকে দেখতে হবে যেন পাঠক্রমের অভিজ্ঞতাসমূহ কতকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিষয়ের সমষ্টিতে পরিণত না হয়। পাঠক্রমটিকে একটি সামগ্রিক সত্ত্বা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। সাধারণত মানব মনের বৈশিষ্ট্য হল সমন্বয়ধর্মিতা। এইরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্য মানুষের মন পরস্পর বিরোধী অভিজ্ঞতা বা বিচ্ছিন্ন জ্ঞান আয়ত্ত করতে অসমর্থ হয়। এইসব বিরোধী ধারণা মানসিক বিকাশের প্রক্রিয়াকেও ব্যাহত করে। সেজন্য অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে পাঠক্রম প্রণয়ন করতে হবে।

ষষ্ঠত, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল শিশুর অন্তর্নিহিত সুপ্ত সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ সাধন। এইরূপ বিকাশের উপর তার ব্যক্তিসত্ত্বার সংগঠনটির পরিপূর্ণতা নির্ভর করে। পাঠক্রমের উন্নয়ন এমনভাবে করতে হবে যাতে শিশুর সম্ভবনা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে।

সপ্তমত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। তাদের মধ্যে এই পার্থক্য দেখা যায় সাধারণত আগ্রহ, প্রবণতা, গ্রহণ ক্ষমতা, মনোভাব, রুচি ইত্যাদির দিক থেকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করতে হলে পাঠক্রম হবে বহুমুখী। অর্থাৎ পাঠক্রমের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার সংযোজন করতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থী তার নিজস্ব আগ্রহ বা প্রবণতা অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে সমর্থ হবে।

অষ্টমত, ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে উদ্ভুত প্রক্ষোভগুলির মধ্যে সমন্বয়ন প্রয়োজন। সমন্বয়নের অভাবে যে আচরণগত বৈষম্য দেখা দেবে তার ফলে তাদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। প্রক্ষোভিক অবস্থানগুলির সাথে সার্থক সঙ্গতিবিধানের অভাব ঘটলেই ব্যক্তিজীবনে এইরূপ আচরণগত অপ্রতিযোজন লক্ষ করা যায়। সেজন্য পাঠক্রমের অভিজ্ঞতাগুলিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রক্ষোভমুলক তৃপ্তি আসে।

নবমত, শিশুর মধ্যে তার নিজস্ব কতকগুলি সম্ভবনা রয়েছে। এগুলি তার প্রকৃতিদত্ত। মূলত এইগুলি প্রকাশ পায় বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনমূলক কর্মের মাধ্যমে। মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় এইসব জন্মগত সম্ভাবনার নাম হল সৃজনক্ষমতা। পাঠক্রম প্রণয়নকারীকে

Scanned by CamScanner

লক্ষ রাখতে হবে যেন পাঠক্রমের মধ্যে সৃজনক্ষমতার বিকাশোপযোগী উপাদানের আয়োজন করা সম্ভব হয়।

দশমত, আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে মানুষের হাতে এসেছে অফুরন্ত সময়। একে সুস্থভাবে কাজে লাগানো দরকার। অবসর সময়টি যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী সঠিক ও বাঞ্ছিত উপায়ে যাপন করতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। তাই পাঠক্রম উন্নয়নকারীর অন্যতম কাজ হল পাঠক্রমের মধ্যে অবসর সংক্রান্ত ব্যবস্থার আয়োজন করা যাতে শিক্ষার্থী সুস্থ ও সমাজ অনুমোদিত পথে অবসর যাপনের কৌশল আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের পরবর্তী পর্যায়টি হল বিষয়বস্তু নির্বাচন। লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে দর্শনের মুখ্য ভূমিকা থাকলেও বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে মনোবিজ্ঞান। কারণ শিক্ষার্থীর জন্য যে সব বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হল সেইগুলি তার মানসিক বিকাশের অনুকূল কিনা তা যাচাই করা দরকার। সব শিশুই একই ধরনের দক্ষতা আগ্রহ বা সম্ভবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে তার নিজস্ব সত্ত্বা বিদ্যমান। ফলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য একই ধরনের পাঠক্রম নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। ব্যক্তিবৈষম্যকে প্রাধান্য দিয়ে শিশুর জন্য কী ধরনের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা প্রয়োজন সেই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞান। পাঠক্রম প্রণয়নে শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি সবিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ মনোবিজ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা শিশুর আচরণ ধারা সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য জানতে পারি। এইসব তথ্য পাঠক্রম প্রণয়নকারীকে নানা ধরনের মূল্যবান নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এই পর্যায়ে শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে কয়েকটি দিক আলোচনা করা হল।

মনোবিজ্ঞানের প্রভাব

প্রথমত, কোনো কিছু শেখার জন্য শিক্ষার্থীর আকাঙ্ক্ষার স্তর (Level of aspiration) সম্বন্ধে পাঠক্রম প্রণয়নকারীকে সচেতন থাকতে হবে। আকাঙ্ক্ষার মাত্রা যত বেশি হবে প্রেষণাও (Motivation) তত কার্যকরী হবে, শিখনের সফলতা বা বিফলতা সব কিছুই নির্ভর করে আকাঙ্ক্ষার স্তরের উপর। সুতরাং পাঠক্রমের অভিজ্ঞতাসমূহ শিক্ষার্থীর আকাঙ্ক্ষার স্তরের পরিপূরক হবে কী হবে না, সেই বিষয়ে গবেষণালব্ধ তথ্য সরবরাহ করে মনোবিজ্ঞান।

দ্বিতীয়ত, প্রেষণা বা আন্তরিক তাগিদ যতই তীব্র হোক না কেন তা বিশেষভাবে নির্ভর করে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহের (intention to learning) উপর। তাই পাঠক্রম প্রণয়নকারীকে শিক্ষার্থীর আগ্রহের উপর ভিত্তি করে অভিজ্ঞতাসমূহ নির্বাচন করতে হবে। বস্তুতপক্ষে শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করতে হলে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে। এইরূপ ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে একমাত্র মনোবিজ্ঞানই শিক্ষাক্রম উন্নয়নকারীকে সাহায্য করতে পারে।

Scanned by CamScanner

তৃতীয়ত, পাঠক্রম নির্ধারণের পূর্বে পাঠক্রম প্রণয়নকারীকে শিক্ষার উদ্দেশ্য (educational objectives) সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। এই সম্বন্ধে বেনজামিন ব্লুম উদ্দেশ্যগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, যথা—(ক) জ্ঞান সম্বন্ধীয় (cognitive) উদ্দেশ্য, (খ) অনুভূতিমূলক (affective) উদ্দেশ্য এবং মনোপেশিজ (psychomotor) উদ্দেশ্য। জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত দিকগুলি হল অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ইত্যাদি। এইসব দিকগুলি সম্বন্ধে পুরোপুরিভাবে জানা থাকলে তবেই কোনো বিষয় সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা গঠন করা যায়। আবার অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্যের দিকগুলি হল গ্রহণ, প্রতিক্রিয়া, গুরুত্ব, সংগঠন ইত্যাদি। অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্যের এইসব দিকের মাধ্যমে কোনো বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থী কীরূপ মনোভাব বা আচরণ প্রকাশ করে তা জানা যায়। অন্যদিকে যে সমস্ত কাজে মন ও পেশির সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয়, সেই সব কাজে মনোপেশিজ উদ্দেশ্যগুলি কার্যকর হয়ে থাকে। পাঠক্রম রচনাকালে প্রণয়নকারীকে মনে রাখতে হবে যে তিনি শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন ধরনের আচরণগত উদ্দেশ্যের পরিবর্তন আশা করেন। আচরণগত উদ্দেশ্যের প্রকৃতি যেরূপ হবে, সেইভাবে তিনি পাঠক্রমের অভিজ্ঞতাসমূহ নির্বাচন করবেন। ফলে এই পর্যায়েও মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

চতুর্থত, পাঠক্রম প্রণয়নের পূর্বে পাঠক্রম প্রণয়নকারীকে কয়েকটি ধাপ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এইগুলি হল— চাহিদা চিহ্নিতকরণ, লক্ষ্য নির্ধারণ, বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং বিষয়বস্তুগুলির সংগঠন। প্রথম পর্যায়ে শিশুর চাহিদাগুলি চিহ্নিত করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে চাহিদাগুলির ভিত্তিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে। তৃতীয় পর্যায়ে উদ্দেশ্য উপনীত হতে হলে কী কী বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে সেগুলি নির্ধারণ করতে হবে। আর চতুর্থ পর্যায়ে বিষয়বস্তুগুলিকে সংগঠিত করতে হবে। পাঠক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাধারণত এইসব ধাপ সম্পর্কে ধারণা গঠনে সহায়তা করে মনোবিজ্ঞান।

পঞ্চমত, পাঠক্রম হবে শিশুর চাহিদাভিত্তিক। পাঠক্রমের মধ্যে শিশুর সকল রকম চাহিদার স্থান থাকা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। শিশুর আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা, মানসিক ক্ষমতা, রুচি, প্রবণতা, প্রতিন্যাস (attitude), ব্যক্তিগত বৈষম্য ইত্যাদি সম্পর্কে পাঠক্রম প্রণয়নকারীকে ওয়াকিবহাল হতে হবে। শিশুর মন সম্বন্ধে এইসব তথ্য শিক্ষাক্রম উন্নয়নকারীকে সরবরাহ করে থাকে একমাত্র মনোবিজ্ঞান।

ষষ্ঠত, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং কার্যত পাঠক্রম মূল্যায়ন শিক্ষাক্রম প্রণয়নের একটি বিশেষ অঙ্গ। ফলে একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কালে তার প্রতিটি ধাপ ধারাবাহিক ও সঠিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে কিনা এবং শিশুর জীবনের চাহিদা পূরণে সমর্থ হচ্ছে কিনা কিংবা সময়ের উপযোগী কিনা— তা যাচাই করা দরকার। এক্ষেত্রে পাঠক্রমকে দুটি পর্যায়ে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। একটির নাম হল নির্মাণকালীন মূল্যায়ন (formative evaluation) এবং অপরটির নাম হল সমষ্টিমূলক মূল্যায়ন (summative

Scanned by CamScanner

evaluation)। পাঠক্রম নির্মাণকালে তার প্রতিটি ধাপে যে মূল্যায়ন করা হয়, তাকে বলে নির্মাণকালীন মূল্যায়ন। আর পাঠক্রম উন্নয়নের পরে তার কার্যকারিতা, প্রয়োগধর্মিতা ও উপযোগিতা যাচাই করার জন্য যে ধরনের মূল্যায়ন করা হয়, তাকে বলে সমষ্টিগত মূল্যায়ন। মূল্যায়ন সম্পর্কে এইরূপ ধারণাও মনোবিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ ফল (Product)।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যদি পাঠক্রমের মধ্যে শিশুর ব্যক্তিগত চাহিদা ও ক্ষমতাগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হয়, শিশুর মানসিক স্তর বা পরিণমনের কথা বিবেচনা করতে হয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারাকে প্রাধান্য দিতে হয়, অনুরাগ বা আগ্রহের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করতে হয়, শিক্ষাকে চাহিদা ভিত্তিক করতে হয় কিংবা জন্মগত প্রবণতার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হয়—তাহলে পাঠক্রম প্রণয়নের সময় শিশুর মনস্তত্ত্বের উপর বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। তা না হলে পাঠক্রমের কার্যকারিতা হ্রাস পাবে এবং সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ পাঠক্রমের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি (Sociological Foundation of Curriculum)– শিক্ষার কাজ শুধুমাত্র জীবনের প্রস্তুতিতে সাহায্য করা নয়, শিক্ষা হল জীবন। ফলে শিক্ষার মধ্যে জীবনের পরিচয় থাকা দরকার। অর্থাৎ শিক্ষা হবে জীবনকেন্দ্রিক। যেহেতু ব্যক্তিজীবন সমাজের পটভূমিতে গড়ে ওঠে, তাই পাঠক্রমে সমাজের প্রতিফলন ঘটবে —এটা অবশ্যই আশা করা যেতে পারে। শিশু সমাজজীবন থেকে বিদ্যালয় জীবনে প্রবেশ করে। আবার শিক্ষা শেষে সমাজে ফিরে যায়। এমত অবস্থায় বিদ্যালয়ের মাধ্যমে যদি সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ না পাওয়া যায়, তাহলে এইরূপ শিক্ষা বাস্তব জীবনের কোনো কাজে আসবে না। আর সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়েরও এক বিরাট ব্যবধান রচিত হবে। পক্ষান্তরে সমাজ জীবনের বিভিন্ন চাহিদা ও সমস্যার সাথে শিশুর পরিচয় থাকলে, তার পক্ষে শিক্ষা সমাপনান্তে বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করা অত্যন্ত সহজসাধ্য হবে। সেজন্য বিদ্যালয়ের সকল কাজকর্মের মধ্যে সমাজজীবনের বিভিন্ন উপাদান থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ পাঠক্রমের মধ্যে বিশেষভাবে সামাজিক চাহিদা ও সামাজিক সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উপাদানগুলির আয়োজন থাকবে।

ভূমিকা

মৌলিক নীতি

পাঠক্রমের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তির পশ্চাতে কতকগুলি নীতি রয়েছে। এই নীতিগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। পাঠক্রম প্রণয়নকারী যদি এগুলি সম্পর্কে সচেতন না হন, তাহলে সমাজকে প্রাধান্য দিয়ে পাঠক্রম রচনা করার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হওয়া খুব বেশি সম্ভব হবে না। নীতিগুলি হল— প্রথমত, শিশুর ব্যক্তিগত দিক ছাড়াও তার সামাজিক দিক রয়েছে। এই দিকটি কোনো মতেই উপেক্ষণীয়

Scanned by CamScanner

নয়। বরং ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে এই দিকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই পাঠক্রম রচয়িতাকে এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবণতা হল যুথবন্ধতা। সমাজে সুষ্ঠুভাবে বসবাস করতে হলে এই ধরনের প্রবণতা অর্থাৎ দলবন্ধভাবে বাস করার প্রবণতা অত্যন্ত অপরিহার্য। শিক্ষাক্রম উন্নয়নকারীকে দেখতে হবে যেন পাঠক্রমের মধ্যে যৌথ জীবনযাপন বা দলবন্ধভাবে বাস করার উপাদানগুলি নিহিত থাকে।

তৃতীয়ত, সমাজের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হলে অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ ও সঞ্চালন প্রয়োজন। এই ধরনের কাজ একক প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভব নয়। এর জন্য সমাজের ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ব্যক্তিবর্গ পরস্পরের মধ্যে যত বেশি সহযোগী হবে সমাজের বিকাশও তত সমৃদ্ধিশালী হবে। সেজন্য পাঠক্রমের মধ্যে এমন সব অভিজ্ঞতা সংযোজন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সমাজের অগ্রগতিতেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

চতুর্থত, শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র সমাজের অগ্রগতির কাজে নিয়োজিত রাখলেই চলবে না, তাকে সমাজ সংস্কারের দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে। সমাজের মধ্যে যে সমস্ত অসাম্য, অবিচার, কুশিক্ষা, ও কুসংস্কার আছে সেইগুলিকে সমাজ থেকে দূরীভূত করতে হবে। এই কাজে শিক্ষার্থীরা যাতে জীবনের প্রথম থেকেই ব্রতী হতে পারে তার উপযোগী আয়োজন পাঠক্রমে থাকতে হবে।

পঞ্চমত, সমাজকে গণতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত করতে হলে সমাজের সদস্যদেরকে জীবনের প্রথম থেকেই প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। এইজন্য পাঠক্রম এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যাতে শিশু গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সাথে পরিচিত হতে পারে।

পাঠক্রম প্রণয়ন কালে সামাজিক ভিত্তি হিসাবে যে দিকগুলির প্রতি আলোকপাত করতে হবে, সেগুলি হল—সমাজের আদর্শ নাগরিক হিসাবে শিশুকে গড়ে তোলা, শিশুর সামাজিকীকরণে সহায়তা করা, সামাজিক গুণাবলির বিকাশে সহায়তা করা, সমাজের দায়িত্ববান সদস্য হিসাবে গড়ে তোলা, সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও অভিব্যক্তির সাথে সার্থক অভিযোজনে সমর্থ করে তোলা, নেতৃত্ববোধের বিকাশ সাধন করা, সমাজ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উপযোগী মানসিকতা গড়ে তোলা, সংস্কৃতির সংরক্ষণে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে সাহায্য করা এবং সামাজিক আচার-আচরণ, রীতিনীতি বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদির সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হতে সহায়তা করা। পাঠক্রমের ভিত্তি হিসাবে সমাজতত্ত্বের ভূমিকা নিম্নোক্ত পটভূমিকায় আলোচনা করা হল—

প্রথমত, মানুষের পরিচয় হল তার সংস্কৃতি। এমনকি তার অর্থপূর্ণ অস্তিত্বও হল সংস্কৃতিরই দান। মানুষের সমাজ জীবন, রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস, শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, নীতিবোধ, আচার-আচরণ, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি সবকিছুর আধার হল সংস্কৃতি। আবার মানুষের মূল শক্তি হল বুদ্ধি। এটিও সংস্কৃতির দ্বারা

Scanned by CamScanner

প্রভাবিত। এমনকি বিভিন্ন সমাজের স্বকীয়তা বা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায় সংস্কৃতির মাধ্যমে। সুতরাং মানুষের প্রয়োজনে যা কিছু প্রয়োজন হয়, সেগুলিই হল সংস্কৃতির উপাদান। এগুলি বাস্তব হতে পারে, আবার মানসিকও হতে পারে। সমাজে দক্ষতার সঙ্গে বসবাস করতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়া দরকার। সেজন্য বিভিন্ন পাঠক্রমের মধ্যে সংস্কৃতির উপাদানগুলি যাতে যথাযোগ্য স্থান পায় সেদিকে পাঠক্রম প্রণয়নকারীকে সবিশেষ নজর রাখতে হবে।

দ্বিতীয়ত, শিশু জন্মগ্রহণের পর ধীরে ধীরে সমাজের নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা, মূল্যবোধ, ভাবাদর্শ, প্রচলিত প্রথা ইত্যাদির সাথে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয়ত্ত করে তাকে বলে সামাজিকীকরণ। এর মূল উদ্দেশ্য হল শিশুকে সমাজের উপযুক্ত সদস্য হিসাবে রূপান্তরিত করা। মূলত এটি হল সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে অভ্যন্তকরণ বা দীক্ষিতকরণের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি শৈশব অবস্থাতেই শেষ হয়ে যায় না। ব্যক্তির সমগ্র জীবন ধরে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে। এই ধরনের প্রক্রিয়া আয়ত্তকরণের উপর সমাজ জীবনে শিশুর অস্তিত্ব নির্ভর করে। সুতরাং এইক্ষেত্রে পাঠক্রম উন্নয়নকারীকে সজাগ থাকতে হবে যাতে পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে শিশুর সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াটি যথাযথভাবে সংঘটিত করা সম্ভব হয়।

তৃতীয়ত, গোষ্ঠী জীবনের সার্থকতা এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে সামাজিক মূল্যবোধের (Social values) উপর। বিশেষভাবে গোষ্ঠীর সদস্যদের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় এই মূল্যবোধের মাধ্যমে। সমাজের সদস্যদের মনোভাব, সামাজিক বিধি ব্যবস্থা, সমাজের আইনগত তাৎপর্য, নান্দনিক ও নৈতিক মান ইত্যাদি সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যেই নিহিত থাকে এবং এগুলি বিচার-বিবেচনা করা হয় আদর্শ মান বা মাপকাঠির ভিত্তিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সামাজিক মূল্যবোধগুলি এক একটি বিমূর্ত আদর্শ হলেও সমাজজীবনে এদের গুরুত্ব বা তাৎপর্য অনস্বীকার্য। তাই বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে যাতে এই মূল্যবোধগুলি সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে পারে তার সংস্থান পাঠক্রমের মধ্যে থাকতে হবে এবং পাঠক্রম প্রণয়নকারীকে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে।

চতুর্থত, সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্ব বিশেষভাবে নির্ভর করে সামাজিক নিয়ম-নীতি (Social norms) মেনে চলার উপর। সুস্থ ও সুষ্ঠু সমাজ জীবনের স্বার্থে এটি একান্তভাবে অপরিহার্য। সমাজের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি এরই মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি সাধারণত প্রকাশ পায় লোকাচার, প্রথা, লোকনীতি, সমাজের প্রচলিত আইন ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে। সুতরাং পাঠক্রমকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সামাজিক নিয়ম-নীতির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পায়

পঞ্চমত, সমাজ হল আন্তঃমানবিক সম্পর্কের এক বিচিত্র জটাজাল। এই ধরনের আন্তঃমানবিক সম্পর্ক যে ধরনের কার্যপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তাকে বলে

Scanned by CamScanner

সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া (Social process)। এরই মাধ্যমে সমাজ জীবনের অগ্রগতির ধারা ও সজীবতা বজায় থাকে। তবে এই কার্যপ্রক্রিয়াটি কোনো একটি একক প্রক্রিয়া নয়। কতকগুলি মৌলিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি। ওইগুলি হল— পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সহযোগিতা-প্রতিযোগিতা, সহাবস্থান। আত্তীকরণ (Assimilation), উপযোজন (accomodation) ইত্যাদি। বস্তুতপক্ষে এইসব মৌলিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয় এবং তার ফলে সমাজের উন্নয়ন ঘটে। তাই শিক্ষার্থীরা যাতে এইসব প্রক্রিয়াগুলির সাথে সম্যকভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পায় তার উপাদান পাঠক্রমের মধ্যে সংযোজন করতে হবে।

ষষ্ঠত, মিথস্ক্রিয়ার (interaction) মাধ্যমে শিশুর দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের বিকাশ সংঘটিত হয়ে থাকে। মিথস্ক্রিয়া হল শিশু ও তার পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এইরূপ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর সম্ভবনাগুলির বিকাশ ঘটে এবং সুষ্ঠুভাবে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও আচরণ আয়ত্ত করে। আবার এরই মাধ্যমে শিশুর অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে তার মানসিক ক্ষমতাগুলি শাণিত হয়। এমনকি মানবীয় পরিবেশে প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে তার সামাজিক বিকাশের পথ প্রশস্ত হয় এবং তার প্রভাবে সে সামাজিক রীতি-নীতিগুলি দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে। অন্যদিকে আবার সমবয়স্কদের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে সে তার অবদমিত প্রক্ষোভগুলির উদগমন ঘটায়। এর ফলে তার প্রাক্ষোভিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এক কথায় মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। সুতরাং শিশুকে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত ব্যক্তিতে পরিণত করতে হলে পাঠক্রমকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে সে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে মিথস্ক্রিয়া করতে সমর্থ হয়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে পাঠক্রমের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তিটি একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়। শিশুর সামাজিক বিকাশে সহায়তা করতে হলে পাঠক্রমে তার উপযোগী আয়োজন থাকা বাঞ্ছনীয়। সামাজিকীকরণের কৌশল বা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কৌশল আয়ত্তকরণের ক্ষেত্রে শিশুকে যদি পাঠক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা না যায়, তাহলে সমাজজীবনে তার অস্তিত্ব বিঘ্নিত হবে। এমনকি সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অন্যতম দিক হিসাবে তার সামাজিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে। শিশুর সুস্থ ও সুষ্ঠু সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে পাঠক্রমের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তির অনুশীলন পাঠক্রম প্রণয়নকারীর কাছে একটি অপরিহার্য অঙ্গ। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কাজ সুপরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন করতে হলে প্রণয়নকারীকে সমাজতত্ত্বের দিকটি গোচরে আনতেই হবে— এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

Scanned by CamScanner